আনন্দবাজার পত্রিকা

ঐতিহ্য আলাদা, দায়িত্বও অনেক

কে দেখাবেন পথ? কারা আমাদের বোঝাবেন যে, বাঙালির এই গভীর ভাষাপ্রেম, সহনশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমন্বয়মুখী সংস্কৃতি আমাদের এক বিশেষ দায়িত্বও দিয়েছে? **জহর সরকার**

সংস্কৃতি: কলকাতায় দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল। নীচে, বর্ধমানের গ্রামে ওলাইচণ্ডী পুজোয় বাঁক কাঁধে ভক্তরা

কলকাতা মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র বলতে আমরা সাধারণত ধর্মতলা ও চৌরঙ্গির সংযোগস্থলকেই মনে করি। দীর্ঘ উত্তর-দক্ষিণ সড়ককে অনেক নামে চিনি— চিৎপুর রোড, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, চৌরঙ্গি বা জওহরলাল নেহরু রোড, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাপ্রসাদের নামে রাস্তা, তার পর দেশপ্রাণ শাসমল রোড। আবার পশ্চিমে গঙ্গার দিক থেকে পূর্বে যাওয়া রাজপথকে আমরা বরাবরই ধর্মতলা বলেই ডেকেছি, যদিও পুরপিতারা অনেক দিন আগেই এর নাম বদলেছেন লেনিনের সম্মানে। দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝে আমরা এক বারও প্রশ্ন করি না, আড়াইশো বছর পুরনো এই দুই প্রধান সড়ক কাদের ইতিহাস বহন করে চলেছে? ধর্মতলা কোন ধর্মের নামে? আর ওই চৌরঙ্গির মানে কী?

অল্পে বলতে গেলে, ধর্মতলা রাঢ় বাংলার বিখ্যাত লোকদেবতা ধর্মঠাকুরের নামে। তাঁকে নিয়ে মধ্যযুগে কত ধর্মমঙ্গল-ই না লেখা হয়েছে! পশ্চিমি জেলাগুলিতে লাউ সেন বনাম হুহুর ঘোষের লড়াইয়ের গল্প এখনও তাজা ইতিহাস। ধর্মতলার ধর্মঠাকুরের মন্দির এখনও আছে, লোটাস সিনেমার সামনে। সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল অনেক দিন আগে, রাস্তা চওড়া করার সময়। এই প্রাক-হিন্দু দেবতাকে সঙ্গ দিচ্ছেন আর একটি সাব-অল্টার্ন ধর্ম— নাথ সম্প্রদায়ের গুরু, চৌরঙ্গী বাবা। কালীঘাটগামী তীর্থযাত্রীরা তাঁর ডেরায় আশ্রয় পেতেন, এটি অবস্থিত ছিল আজকের ঝলমলে রাস্তার সংলগ্নে।

এক কথায়— উচ্চবর্ণীয়, উচ্চবর্গীয় ভদ্রলোকদের সাম্রাজ্যের ভিত কিন্তু প্রায় পুরোপুরি ভরসা করে মধ্য ও নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর। বাংলায় দেশজ বা আদি বাসিন্দারা সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও যুগ-যুগান্ত ধরে তাঁদের উপর শাসন চালিয়ে গিয়েছে উচ্চ জাতির সংখ্যালঘু হিন্দুরা— এমনকি বৌদ্ধ পাল রাজাদের আমলেও। তার পর তাঁদের দমন করে রেখেছিলেন পাঠান ফার্সি ও অন্যান্য আশরাফ মুসলিম গোষ্ঠীরা। প্রজা তো প্রজা-ই, সে হিন্দু হোক বা মুসলমান। বাংলায় হাজার বছর পুরনো বৃহৎ মন্দির-স্থাপত্যের অভাব থেকে অনুমান করা যায়, সাধারণ মানুষ তথাকথিত হিন্দু যুগেও উচ্চ শ্রেণির মর্মের প্রতি খুব একটা আকৃষ্ট হননি। ওই যুগেও বাংলার হিন্দু বা বৌদ্ধ রাজারা এখানে কোনও মাদুরাই-তাঞ্জাভুর-মহাবালেশ্বর, কোনারক-ভুবনেশ্বর বা ইলোরার মতো মহত্তম ও বৃহৎ মন্দির-স্থাপত্য নির্মাণ করতে পারেননি বা করেননি। এ সব প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন সমৃদ্ধ রাজা, অজস্র রাজস্ব, মজবুত ব্রাহ্মণ শ্রেণি এবং প্রজাদের অঢেল সমর্থন। এই সব না থাকায়, প্রাক-ইসলামীয় যুগের মন্দির তো পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে পাওয়াই যায় না, আর রাঢ় অঞ্চলে তাদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। বাঁকুড়ায় দু'টি, বর্ধমানে দু'টি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় একটি আর বরাকর-পুরুলিয়া প্রান্তে ছিল গুটিকয়েক। কিন্তু একই দেশে পাহাড়পুরে, মহাস্থানগড়ে, সোমপুরায়, বিক্রমপুরে, চিরুটিতে আমরা বিশাল বৌদ্ধ স্থাপত্যকর্ম পাই।

স্বীকার করতেই হবে, ইতিহাসের আদি ও মধ্য যুগে বাংলায় (রবার্ট রেডফিল্ডের ভাষায়) 'লিটল ট্র্যাডিশন' অর্থাৎ গৌণ বা লোককর্মীয় পরম্পরাই প্রভাবশালী ছিল। ওই আচার-বিশ্বাস পদ্ধতি 'গ্রেট ট্র্যাডিশন' (মোহান বা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম) বা মন্দির-ভিত্তিক সভ্যতার চেয়ে অনেক বেশি প্রকট বা বিস্তারিত ছিল। এখানে আদি ও মধ্য যুগে গ্রেট ট্র্যাডিশন বা পৌরাণিক দেবদেবীর বিশাল আকারে পূজার নিদর্শন পাওয়াই যায় না। মানুষ মঙ্গলকাব্যের পালা শুনতে ও দেখতে ভিড় করত, যেখানে মনসা, শীতলা, চণ্ডীর মতো লৌকিক দেবীরা পৌরাণিক দেবদেবীদের জব্দ করতেন। তা দেখার জন্যে মানুষ রাতের পর রাত জাগত। এই তথাকথিত নিম্নবর্গের জনসমুদ্রকে নিজের দিকে টানার জন্যেই উচ্চবর্ণের গ্রাম্য কবিরা লেখেন অগণিত মঙ্গলকাব্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য আর শ্রীনিত্যানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ওই একই লক্ষ্য ছিল: নিম্ন ও মধ্য জাতিকে নিজেদের দিকে টানা।

অন্য দিকে অসংখ্য সুফি ও পির জাতি-বিভাজিত সমাজে গৌণ সম্প্রদায়ের মন জয় করছিল। এঁরা বাংলার বৃহৎ সংখ্যার মানুষের জন্য ইসলাম ধর্মকে অনেক সহজ ও মানানসই করে তুলেছিলেন। এখনকার হিসাবে ২৬ কোটি বাঙালির মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ ইসলাম বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। কিন্তু গড় বাঙালির কাছে বাংলা ভাষা ও সত্তাই প্রধান, গর্বের কারণ।

পাশাপাশি বাংলায় নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে দেবদেবীদের স্থান করে দিয়েছিল মঙ্গলকাব্য। আর গৌর-নিতাই বুকে টেনেছিলেন সব জাতিকে। এই সামাজিক ও ধর্মীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বঙ্গীয় সংস্কৃতির বৃহৎ ছত্রছায়ায় বিভিন্ন স্তরের মানুষ নিজেদের স্থান করে নিলেন। ভাষা তাঁদের মধ্যে অটুট বন্ধন, আর খাদ্যরুচি প্রায় এক।

বাঙালি জীবনে লোকবিশ্বাস এখনও অত্যন্ত প্রভাবশালী। তার মানে এই নয় যে, তাঁরা ইসলাম বা হিন্দু ধর্মকে কোনও অংশে অবজ্ঞা করছেন। ওঁরা মনে করেন, কেউ যদি সত্যনারায়ণ বা সত্যপিরের উৎসব করে সুস্বাদু শিন্নি দেয়, খাব না কেন? কেউ যদি ওলাইচণ্ডীকে ওলাই বিবি বলে মাথা ঠেকায়, ককক না। অনেক পিরের দরগায় হিন্দুরাই বেশি ভিড় করেন, ধূপ গোঁজা তো মন্দিরের বাইরেও হয়। হরিনামসঙ্কীর্তনের পর বাতাসা বা হরির লুট কি নবি-গুণ পাঠের পর বাতাসা বিতরণ করা থেকে এল, না কি উল্টোটা সত্যি? তা আমরা বলতে পারব না, কিন্তু তর্ক না করে আরও দু'টি বাতাসা খাওয়াই ভাল। দক্ষিণ রায় আর বনবিবি কোন ধর্মের জেনে লাভ কী— বাঘের হাত থেকে রক্ষা করলেই হল।

এই মনোভাব অনেকেই বুঝে উঠতে পারেননি— মহম্মদ আলি জিন্না ও আয়ুব খান তো নয়ই। দু'জনেই জোর করে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে দমন করার বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন, আর কিছুতেই মানতে পারেননি সাচ্চা মুসলমান কী করে এই ভাবে তাঁদের ফরমানের বিরোধিতা করছে। ভদ্রলোকদের একটি শ্রেণি লাগাতার প্রচার করেছে এবং করে চলেছে 'আমরা বাঙালি ওরা মুসলমান'। মানেটা স্পষ্ট না হলেও দম্ভ ও বিদ্বেষ খুবই পরিষ্কার। কিন্তু পশ্চিমের হিন্দুদের মধ্যে এই বিভাজিকর প্রচারের উচিত জবাব দিয়েছেন বাংলার নির্বাচকেরা, কয়েক মাস আগে।

যাঁরা এই সব উক্তি করেন তাঁরা জানেন না যে, বাঙালি জাতিকে ইতিহাসে প্রথম বার একত্রিত করেছিলেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ। ১৩৬২ খ্রিস্টাব্দে তিনি পৃথক অঞ্চল বা রাজ্যগুলিকে এক করে নামকরণ করেছিলেন স্বাধীন ও সংযুক্ত বাংলা সুলতানাত। তখনকার অভিজাত ব্রাহ্মণ তাঁদের দেবভাষা ছেড়ে বাংলায় কথা বলতে রাজি ছিলেন না, বাংলায় লিখতেনও না। বাংলা ভাষায় আনুমানিক দশ হাজারেরও বেশি ফার্সি ও আরবি শব্দ আছে, কিন্তু ক্রমশ অনেক বেশি শব্দ আমদানি করা হল সংস্কৃত থেকে। অলঙ্কার ও উপযোগিতা বাড়ল, কিন্তু বেশ কয়েকটি ফার্সি বা আরবি শব্দকে ঠেলে দেওয়া হল, অন্তত কলকাতার ভদ্রলোক সমাজে।

উনিশ শতকের গোড়ায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি নিজের স্বার্থে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করেছিল, তা হয়ে উঠল সংস্কৃত পণ্ডিতদের ঘাঁটি। ওখানকার পণ্ডিতরা অঢেল সংস্কৃত শব্দ তৎসম বলে প্রয়োগ করে অনেক নতুনত্ব আনলেন ঠিকই, কিন্তু তার সঙ্গে বাংলা ভাষার হিন্দুকরণও বাড়ল। একই সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এক নতুন হিন্দু জমিদার শ্রেণি তৈরি হল, পুরনোদের এক গোষ্ঠীকে আরও শক্তিশালী করতে তা সাহায্য করল। পাশাপাশি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্যবিদ্যাবিদীরা পুরোপুরি না বুঝেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের একতরফা ব্যাখ্যা মেনে নিলেন। তাঁরা প্রচার করলেন, হিন্দু সমাজ আদি কাল থেকেই উচ্চবর্ণকেন্দ্রিক ছিল। ইতিহাস দিয়ে এটি প্রমাণ করা মুশকিল, কিন্তু 'মিথ'টি শুধু প্রতিষ্ঠিতই হল তা নয়, এক অনড় সত্যেও পরিণত হল।

বাংলার অর্থনীতি ও সমাজে আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতিকেও হিন্দু ভদ্রলোক গোষ্ঠী প্রায় পুরোপুরি অপহরণ করলেন। তা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ও অন্য হিন্দু শ্রেণির মানুষ আস্থা হারাননি। বাংলার নবজাগরণেও খুব একটা স্থান না পেলেও, সব বাঙালিই রামমোহন বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গর্ব করে। এর ফলে বাঙালি জাতির মধ্যে গড়ে উঠেছে এক পৃথক সমন্বয়মুখী চরিত্র ও একটা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য।

ধর্মভেদ বা জাতিভেদ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিম বা পূর্ব বঙ্গদেশে এখনও বিদ্বেষের উপর কিছু আবরণ আছে। আজও সম্ভবত সহপাঠী বা সহকর্মীদের জাত জিজ্ঞাসা করে না বাঙালি। তবে যত দিন যাচ্ছে, বাংলার মানুষের এই সমন্বয়গামী সংস্কৃতির গভীরতা ও শক্তির পরীক্ষা বাড়ছে। দুই বাংলাতেই মৌলবাদীরা যে শুধু মাথাচাড়া দিচ্ছে তা নয়, ক্ষমতা দখল করার কাছাকাছি পৌঁছেও যাচ্ছে।

নিকট ভবিষ্যতেই আমাদের প্রমাণ করতে হতে পারে যে, এই বিশাল উপমহাদেশের এত ভাষাগত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাংলা তার ঐতিহ্যে অটল। কিন্তু কোনও মনীষী তো আর চোখে পড়ছেন না। কোথায় গেলেন আমাদের রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজি, নজরুল, মুজিবুর অথবা অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন? সত্যজিৎ রায়ের কোনও উত্তরাধিকারী নেই, আর গত দু'বছরে আমরা হারালাম দুই বাংলার প্রকৃত বিবেক— আনিসুজ্জামান ও শঙ্খ ঘোষকে। অমর্ত্য সেন থাকুন আমাদের মধ্যে, কিন্তু তার পর? এই মাপের আর কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।

তা হলে কে দেখাবেন পথ? কারা আমাদের পাশে থেকে বোঝাবেন, বাঙালির এই গভীর ভাষাপ্রেম, সহনশীলতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমন্বয়মুখী সংস্কৃতি আমাদের এক বিশেষ দায়িত্বও দিয়েছে? তা হল আমাদের অনুপম বাঙালি সত্তা আর উদার বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকা, আর ধর্মীয় ও সামাজিক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আমাদের অক্লান্ত আপসহীন বিরোধ চালিয়ে যাওয়া।